বালুচর

জসীম উদ্‌দীন (পল্লী কবি)

সূচী ॥

বাঁশরী আমার, ৭
উড়ানীর চর, ৮
সে বসে পড়িছে বই, ১১
একখানি হাসি, ১২
সফল সন্ধ্যা, ১৪
কাল সে আসিবে, ১৬
কাল সে আসিয়াছিল, ১৮
প্রতিদান, ২৬
পরাজয়, ২৭
কবির সমাধি, ২৮
কারে অভিমান, ৩৫
তোমার ভুলেছি আজ, ৩৮
দুরাশা, ৪৬
বিদায়, ৪৭
সন্ধ্যা, ৫৩
মুসাফির, ৫৪
আর একদিন আসিও বন্ধু, ৫৭

বাঁশরী আমার

বাঁশরী আমার হারায়ে গিয়াছে
বালুর চরে,
কেমনে ফিরিব গোধন লইয়া
গাঁয়ের ঘরে।

কোমল তৃণের পরশ লাগিয়া
চরণে নূপুর পড়িছে খসিয়া ;
চলিতে চরণ উঠে না বাজিয়া
তেমন করে,
বাঁশরী আমার হারায়ে গিয়াছে
বালুর চরে।

কোথায় খেলার সাথিরা আমার
কোথায় ধেনু,
সাঁঝের হিয়ায় রঙিয়া উঠিছে
গোখুর-রেনু।

readNshare BI

ফোটা সরিষার পাপড়ির ভরে,
চোরো মাঠখানি কাঁপে থরে থরে ;
সাঁঝের শিশির দুটি পাও ধরে
কাঁদিয়া করে—
বাঁশরী আমার হারায়ে গিয়াছে
বালুর চরে।

উড়ানীর চর

উড়ানীর চর ধূলায় ধূসর
যোজন জুড়ি
জলের উপরে ভাসিছে ধবল
বালুর পুরি।

ঝাঁকে বসে পাখি ঝাঁকে উড়ে যায়
শিথিল শেফালি উড়াইয়া বায়;
কিসের মায়ায় বাতাসের গায়
পালক পাতি;
মহা কলতানে বালুচার পানে
বেড়ায় মাতি।

উড়ানীর চরে কৃষাণ-বধূর
খড়ের ঘর,
ঢাকাই শিমের উড়িছে আঁচল
মাথার পর।

আঙিনা ভরিয়া লাউএর লতায়
লক্ষ্মী সে যেন দুলিছে দোলায়;
ফাগুনের হাওয়া কলার পাতায়,
নাচিছে ঘুরি;
উড়ানী চরের বুকের আঁচল
কৃষাণ-পুরি।

উড়ানীর চর উড়ে যেতে চায়
হাওয়ার টানে;
চারিধারে জল করে ছল ছল
কি মায়া জানে।

ফাগুনের রোদ উড়াইয়া ধূলি,
বুকের বসন নিতে চায় খুলি,
পদ ধরি জল কলগান তুলি,
নূপুর নাড়ে;
উড়ানীর চর চিক্ চিক্ করে
বালুর হারে।

উড়ানীর চরে ছাড়-পাওয়া রোদ
সাঁঝের বেলা—
বালু লয়ে তারা মাখামাখি করি,
জমায় খেলা।

কৃষাণী কি বসে সাঁঝের বেলায়
মিহি চাল ঝাড়ে ক্ষেতের কুলায়,
ফাগের মতন খুঁড়া উড়ে যায়
আলোক ধারে ;
কাটি ঘাসে তারা জড়াজড়ি করে
পাড়ের পারে।

উড়ানীর চরে তৃণের অধরে
বসন্তের বাণী,
আঁধারের ঢেউ ছোঁয়াইয়া যায়
কি মায়া টানি।

বিরহী কৃষাণ বাজাইয়া বাঁশি
কাল-রাতে মেখে কাল-ব্যথারাশি,
থেকে থেকে চর শিহরিয়া উঠে
বালুকা উড়ে ;
উড়ানীর চর ব্যথায় ঘুমায়
বাঁশীর সুরে।

সে বসে পড়িছে বই

শুইয়া সে পড়িতেছে বই।
এ ঘরেতে আর কেহ কোথা নাই শুধু এই আমি বই।
খণ্ড রোদের টুকরো আসিয়া পড়েছে তাহার মুখে ;
—রাঙা মুখে হাসি, তারি ঢেউ লেগে দুলিতেছে তারা সুখে।
খানিক সে পড়ে, খানিক আবার চায় মোর মুখ পানে,
আমি কবিতার কথা মালা গাঁথি দুলাইতে তার মনে।
তাহার চাউনি, দুটি কালো চোখে, যেন দুটি কালো অলি,
হেলিয়া দুলিয়া দুপায়ে দলিছে মুখের কমল-কলি।
তার ডানাখানি মোরপাখে লাগা, মিতনীর মত এসে,
বুঝি ক্ষণকাল বিরাম মাগিছে আমার মেঘের দেশে,

বই সে পড়িছে, কি বই জানিনে, কে জানে কি আছে লেখা,
আমি দেখিতেছি ক্ষনে ক্ষনে তার মুখেতে হাসির রেখা।
তার রাঙা মুখে হাসি দুলিতেছে সে হাসির সরোবরে,
দুই গালে দুটো রাঙা রাঙা টোল ফুটিতেছে লীলাভরে।
সেই রাঙা টোলে ভ্রমর বসিত। অথবা দুইটি ফুল,
দুই গালে কেউ বেঁধে দিয়ে গেছে মিছেমিছি করি ভুল।
নারে না ও মুখ যত হাসি করে, আর যত রূপ ধরে,
হয়ত তাহারি গড়ায়ে গড়ায়ে দুটি টোল হবে ভরে।
তার রাঙা মুখ, আরো রাঙা হাসি, আজও পড়িছে বই,
এ ঘরেতে আজ আর কেহ নাই এই একা আমি বই।

একখানি হাসি

দিনভর তার বহু কাজ ছিল, এখানে ওখানে ফিরি,
যত্নে ও স্নেহে কাজের মধ্যে ফুটাইতেছিল ছিরি।
মোরে ডাকি কথা দিবে কখন? কুঞ্জের পথের পরে,
সারা দিনমান আঁটি আঁটি বেঁধে মল্লিকা যূথিকা থোরে।
এ দেশের সব উল্টো ব্যাভার, হাটে হাটে যাও তেল,
কেউ শুনিবে না কেউ আসিবে না বাহুটিতে তারে গোল।
কানে কানে কথা বলিবে যখনি যখনি সকলে আসি,
না শুনেও তার ঠিকি-ঝিকি বাজাইবে বাঁশি বাঁশি।
জোরে যাহা বল, কারো ভ্রূক্ষেপ হইবে না শুনিবারে,
চুপি চুপি তাহা বলে দেখ দেখি কজন না শুনে পারে?

জগৎ জুড়িয়া করে কোলাহল মর্ত্ত্যলোকের চিন্তা,
গোপন কথার ভাষা লিখিছে লইয়া নিত্তির ক্ষিতা।
তবু এরি মধ্যে এক কোণে সে যে বিকৃত আঁধারে দেখি,
গোলাপের মত দুটি ঠাণ্ডা ঠোঁটে একখানা হাসি দেখি।
একখানা হাসি,—যেন আকাশের একখানা মেঘ ছেড়ে,
পূর্ণিমার জোছনার জল পড়িছিল বেয়ে বেয়ে।
যেন প্রভাতের সোনালী আলোকে বাঁধিয়া পাখার গায়,
এক ঝাঁক পাখি উড়ে চলেছিল আকাশের কিনারায়।
যেন দীর্ঘ বধু প্রদীপ ভাসায়ে গাঙের ঘাটের জলে,
কাঁকন বাজায়ে কলস হেলায়ে দূর পথে গেল চলে।

আজিকে তাহার বহু কাজ ছিল, মোরেও ছিল ব্যস্ততা,
সবগুলি তার জড়াইয়া দিল একটি হাসির লতা;—
সেই লতা-পরে ফুল ফুটেছিল, তাহাতে বসে মধুকর,
কথায় কথায় জোড়া দিতেছিল সোহাগের তাজ-ঘর।
একখানি হাসি দেখেছিনু তার, যেন বহুদিন পরে,
দূর দেশ হতে অতি চেনা কেউ চিঠি লিখিয়াছে মোরে।
একখানি হাসি। আকাশ হইতে একটি পাখির গান,
দুপুরের রোদে লাঙল চষিতে কৃষক সবীর তান।
একখানি হাসি। পঙ্কিনী জলে যেন বেহুলার ভেলা,
লখিন্দরেরে জীবন্ত করি দেশেতে ভরেছে মেলা।
যেন আকাশের বুকে ভেসে যায় একটি রঙিন ঘুড়ি,
তারি পরে যেন বক্ষ রাখিয়া কোথা যাওয়া যায় উড়ি।
একখানা হাসি। নহে বহু কথা, নহে প্রিয়, প্রিয়তম,
আরও কোনকিছু যদিও দেখেনি, নহে তার চেয়ে কম।

ও-যেন কথার গীতগোবিন্দ। হাফেজের বুলবুলী,
—যারি মাঝে বসি শাখায় শাখায় তারা উড়ো-কথা বুলি।
একখানি হাসি। বাঁকা তাঁরি বেয়ে এসেছে ঈদের চাঁদ,
যেন তারি গায় লেখা রহিয়াছে হেরেমের ফরমান।

সফল সন্ধ্যা

সন্ধ্যা এখন আবছা মেঘেতে যাচ্ছে রঙ্ ভরে ধরে,
নক্সি কাঁথাটি বুনট করিছে অতি সুনিপুণ করে।
এমন সময় তুমি এলে হেথা, ও বাড়ির জানালায়,
মেয়ে-ফুলগুলি হাসি খুশিভরা, কে আর ওদিকে চায়।
কলতলে কোন রূপসী বসিয়া মাজিছে বাসনগুলি,
কাঁচের চুড়ি যে আহ্লাদে নাচে বাহুর বরণে ভুলি।
এসব আজিকে মুলতুবি থাক, তুমি এলে মোর ঘরে,
ভালই হইল, সময় কাটিবে কথা কওয়াকওয়ি করে।

তুমি এলে আজ, অঙ্গে রাঙায়ে এনেছ ইন্দ্রচীর,—
হাসিতে ছুড়িছ বরণে বরণে যত ফুল ধরণীর।
আজিকার দিনে তোমারে হেরিয়া বহু কিছু করা যায়,
ও রাঙা হাসির পাখায় উড়িয়া আকাশের কিনারায়,
চলে যাওয়া যায়, সেই সে হাসিরে ধরিয়া কেশের জালে,
চির-জনমের করে রাখা যায়, আমাদের এই কালে।
রঙীন বাতাসে ও অধর ফুল হতে রাঙা দলগুলি,
মেলে দেখা যায় তাহার উপরে কথার তোমার তুলি
—আরো পারা যায়, ও দেহ ধনুতে যত ফুল-শর-রাশি,
আমার এ বুকে ধরে দেখা যায় কি করে তাহারা আসি।
হয়ত তাহারা দলে দলে দলে এ-মন-মানস-সরে
কত যে লীলার কমল ফুটাবে অযাচিত আদরের ভরে।

এতে কি আমার অপরাধ হবে? তুমি বড় সুন্দর,
ওই মন্দিরে যে পরাণ সে ত আরও সুন্দরতর।
ও অধর আর ওই রাঙা হাসি, ওই ফুল তনুখানি,
অনাহুত কোন রাগিণীতে যেন আমারে ফিরিছে টানি।
এত ভাল লাগে এ দেহ তোমার, সেথায় যে প্রাণ থাকে,
সেকি একবার সাড়া দিতে নারে ভালবাসি এই ডাকে।
ও রাঙা ঠোঁটের কালো তিলটির তোমার পাখার পরে,
সেকি ওই কথা উড়াতে পারে না আজিকে আমার তরে।

এমন উদার তুমি কি কখনো হইতে পারনা হায়,
একদিন তরে যদি দেহখানি মোরে ধার দেওয়া যায়।
তবে আমি রচি ওই দেহ দিয়ে এমনি শান্তি নীড়,
ধু ধু মরু ঘেরা আশা-ভরসাহীন এই ধরণীর তীর।
পান্থ পাখীরা সেইখানে আসি খুলিয়া মনের দুখ,
সারাটি রজনী জাগিয়া পাবে প্রকাশের সুখ।
ওই দেহ তবে মুকুর করিয়া ঝুলাব আকাশটায়,
বিরহীরা তাতে ধরিয়া দেখিবে ঘর যার বেদনায়।
ওই দেহ তবে বাঁশরী করিয়া বাঁধিব তমাল ডালে,
জগতের কত শূন্যতা আনি জড়ায় সুরের জালে।
এই ধরণীর রূপ-পিয়াসীরা তাহাতে নিশ্বাস ভরি,
না পাওয়ার ব্যথা কত যে তীব্র দেখিবে পরখ করি।

কাল সে আসিবে

কালকে সে নাকি আসিবে মোদের ওপারের বালুচরে,
এ পারের ঢেউ ওপারে লাগিছে বুঝি তাই মনে করে।
বুঝি তাই মনে করে,
বাউল বাতাস টানাটানি করে বালুর আঁচল ধরে।
কাল সে আসিবে, মুখখানি তার নতুন চরের মত,
চখা আর চখি নরম ডানায় মুছায়ে দিয়েছে কত।
চরের চাষির ধানের খেতের মতই তাহার পা,
কোথা বা হলুদ, আবছা হলুদ, কোথা বা হলুদ না।

কাল সে আসিবে, হাসিয়া হাসিয়া রাঙা মুখখানি তার,
ওপারে আমার পাতার কুটিরে আমি কিবা আজ করি।
কাল সে আসিবে, ওই বালুচরে, ওপারে আমার ঘর,
তার পরে নদী— ঘাটের ডিঙা কাঁপে নদীটির পর।
কাল সে আসিবে, নোঙর ছিঁড়িল, দুলিছে নায়ের পাল,
কারে হারায়েছি, কারে যেন আমি দেখি নাই কত কাল।
ওপারেতে চর বালু খেলে, উড়ায় বালুর রথ,
ওখানে সে কাল দুটি রাঙা পায়ে আঁকিয়া যাইবে পথ।
কাল সে আসিবে ওই বালুচরে, আমি কি আবার হায়,
আসমান-তারা শাড়ীখানি আজ জড়াব সারাটি গায়?

আসমানফুল শাখা দুগাছি পরিব আবার হাতে,
খোঁপায় জড়াব কিংশুক-কলি, কাজল চোখের পাতে,
গলায় কি আজ পরিতে হইবে পদ্ম-দানার মালা,
কানাড়া ছাঁদে বাঁধিব কি বেণী কপালে সিঁদুর আলা?
কাল সে আসিবে, মিছেই ছিঁড়িছি আঁধারের কালো কেশ,
আজকের রাত পথ ভুলে বুঝি হারাল উষার দেশ।

ওই বালুচরে আসিবে সে কাল, তার রাঙা মুখ ভরি,
অফুট উষার সোনার-কমল আসিবে সোহাগ ধরি।
সে আসিবে কাল, গলায় পরিয়া কুসুম ফুলের হার,
দুখানি নূপুর মুখর হইবে চরণ জড়ায়ে তার।
মাথায় বাঁধিবে মুথালির লতা কচি শীষলতা কানে,
বেণুর আগায় দুলিয়া দুলিয়া মুখর করিবে গানে।
কাল সে আসিবে, হাট-সরিষার ফুলনি কোটার শাড়ী,
মটর কলের সাথে করে যেন খুলে দেখ নাড়ি নাড়ি।
কাল সে আসিবে ওই বালুচরে, মাঝে তার এই নদী,
ওপারে কূলে মোর ভাঙা কুঁড়ে ঘর, বহু দূরে নয় যদি;
তবু কি তাহার সময় হইবে হেথায় চরণ ধরি,
মোর কুঁড়ে ঘর দিয়ে যাবে হায়, মণিমাণিকেতে ভরি।
সে কি এই চরে দাঁড়ায়ে দেখিবে বরষার জলগুলি,
শীতের আপদ কাঁপে বা সুধিছে আতপে পায়ে ধূলি?
হয়ত দেখিবে, হয় দেখিবে না, কাল সে আসিবে চরে,
ওপারে আমার ভাঙা ঘরখানি, আমি থাকি সেই ঘরে।

কাল সে আসিয়াছিল

কাল সে আসিয়াছিল ওপারের বালুচরে,
এতখানি পথ হেঁটে এসেছিল কি জানি কি মনে করে।
কাশের পাতায় আঁচড় লেগেছে তাহার কোমল গায়,
দুটি রাঙা পায়ে আঘাত লেগেছে কঠিন পথের ঘায়।
সারা গাও বেয়ে ঘাম ঝরিতেছে, আলসে অবশ তনু
আমার দুয়ারে দাঁড়াল আসিয়া দেখিয়া অবাক হনু।

দেখিলাম তারে—যার লাগি একা আশা-পথ চেয়ে থাকি,
এই বালুচর মাঝে ঘুরে ঘুরে ফুকারিয়া যারে ডাকি।
দেখিলাম তারে—যার লাগি এই উদাস কাউ-এর বন,
বছর বছর মোর গলা ধরি কাঁদিয়াছে ক্রন্দন।
দেখিলাম তারে তবু কেন হায় বলিতে নারিনু ডাকি,
কোন অপরাধে আমার ললাটে দিলে এত ব্যথা আঁকি?
—বলিতে নারিনু, ওগো পরবাসী, দেখিতে এলে কি তাই,
আগুন জ্বেলেছ যেই বন-বনে সেথা পুড়ে হল ছাই?
এলে কি দেখিতে দূর হতে যারে হেনেছিলে বিষ-বাণ,
সে বন-হরিণী বেঁচে আছে কিবা জীবনের অবসান?
বলিতে নারিনু—নিঠুর পথিক, কেন এলে মিছেমিছি,
অলস চরণ, অবশ দেহটি, সারা গায়ে ঘাম, ছি ছি!
এতখানি পথ হাঁটিয়া এসেছ কত না কষ্ট সহি,
তারি কাছে মোর দুখের কাহিনী কেমন করিয়া কহি?

ঘড়ার জল মুছিয়া ফেলিনু, মুখে মাখিলাম হাসি,
কহিলাম, বুঝি পূবের সুরুয পশ্চিমেতে উদিল আসি।
আঁচলে তাহারে বাতাস করিনু চরণ দুখানি ধুয়ে,
মাথার কেশেতে মুছাইয়া দিয়ে বসিলাম কাছে নুয়ে।
কহিলাম, বড় ভাগ্য আমার, আজিকার দিন ধনি,
এমনি করিয়া রাখা যায় নাকি দুই হাতে যদি টানি।

বধির চলার পথ,
আজিকার তরে ভুলিতে পারো না অস্ত-পারের পথ?
কৌটায় ভরে সিঁদুর ত রাখি, আজিকার দিন শুভ,
এমনি করিয়া কৌটার মাঝে ভরে কি রাখা না যায়?
এই দিনটিরে মাথার কেশেতে বেঁধে রাখা যায় নাকি?
মিছেমিছি কত বকিয়া গেলাম ছুটি শুধু থাকি থাকি।
শুনে সে কেবল হাসি-মুখে তার আরও মাখাইল হাসি,
সেই রাঙা মুখ—যে মুখারে আমি এত করে ভালবাসি

মুখেতে মাখিল হাসি,
সোনা দেহখানি নাড়া দিয়ে গেল বুঝি হাওয়া মুক্ত-বাসী।
কাল এসেছিল এই বালুচরে আর মোর কুঁড়ে ঘরে—
তার পাশে চলে ছোট্ট নদীটি দুইখানি তীর ধরে।
—সেই দুই তীর রবি-শশীতে দিগন্ত গেছে ভরি—
হায় সখিরে জড়াজড়ি করে দুখের আঁচল ধরি।
তারি এক তীরে বাঁকা পথখানি, দীঘল বালুর লেখা,
সেই পথ দিয়ে এসেছিল কাল এঁকেবেঁকে পায়ের রেখা।

কাল এসেছিল, চখা আর চখি ও ওরে আদর করি,
পাখা নেড়েছিল, তারি ঢেউ লাগি নদী উঠেছিল নড়ি।
—তারি ঢেউ বুঝি ভেসে এসেছিল আমার পাতার ঘরে—
বহুদিন পরে পেয়েছিনু তারে শুধু কালকের তরে।

কালকের দিন, মেঘ-কুহেলির অনন্ত আঁধিয়ারে
শুধু একখানি আলোক কমল ফুটেছিল এক ধারে।
মহা-সাগরের দিগন্ত-জোড়া ফেন-লহরির পারে,
প্রদীপ-তরণী ভেসে এসেছিল বুঝি এ বালুর চরে।
কালকে তাহারে পেয়েছিনু আমি, হায় হায় কত-কাল,
যারে ভাবি এই শূন্য বালুচরে চিতায় দিয়েছি জ্বালা;
সেই তারে হায়, বেঁধিয়া নারিনু খুলিয়া দেখাতে আমি,
এই জীবনের যত হাহাকার উঠিয়াছে দিন-যামী;
যে আগুনে আমি জ্বলিয়া মরেছি সে দবদাহন আনি,
কোন্ প্রাণে আমি নারী হয়ে সেই ফুলের তনুতে হানি।

শুধু কহিলাম,—পরাণ-বঁধু! তুমি এলে মোর ঘরে,
আমি ত জানিনে কি করে যে আজ তোমারে আদর করে।
বুকে যে তোমারে রাখিব বন্ধু, বুকেতে শ্মশান জ্বলে;
নয়নে রাখিব! হায়রে অভাগা, ভাসিয়া যাইবি জলে।
কপালে রাখিব! এ বড় পাপে আমার কপাল পোড়া;
মনে যে রাখিব, ভেঙে গেছে সে যে কভু নারে পায় জোড়া।
সে কেবল শুধু ছল ছল করে চাহিল আমার পানে;
ও যেন আরেক দেশের মানুষ, বোঝে না ইঙ্গিত মানে।

সবুজে সবুজে দেখিলাম তারে দেখিলাম সেই মুখ—
ভাবিলাম ওই সুন্দর হইতে কি করে যে আসে দুখ।
দেখিতে দেখিতে সকাল কাটিল, দুপুরের উঁচু বেলা,
পশ্চিম দেশে গড়ায়ে পড়িল মেঘেতে আঁকিয়া খেলা।
বালুচর হতে বিদায় মাগিল নতুন বকের সারি,
পাখায় পাখায় আকাশের বুকে শেফালীর ফুল নাড়ি।

সে মোরে কহিল, দিন চলে গেল, আমি তবে আজ আসি?
—তার চখা মুখ ফুলের মতন, তাতে মাখা মিঠে হাসি;
সে মোরে কহিল, একটি কথায় ভাঙিল স্বপন মোর,
ভাঙিল তাহার সোনার কুঁড়িটি, ভাঙিল সকল ঘোর।
সে মোরে কহিল, শোন অভাগিনী! আজকের মত তবে,
বিদায় হইনু, আবার আসিব মোর খুশি হবে যবে।

হাসিয়াই তারে কহিলাম, সখা! বিদায় নমস্কার!
অভাগিনী আমি রুধিতে নারিনু নয়ন জলের ধার।
খানিক যাইয়া ফিরিয়া চাহিল, কহিল আমারে, শোনো,
চোখে কেন জল, কিছু করে তোমা ব্যথা কি দিয়েছি কোনো?

আমি কহিলাম, সুন্দর সখা আমার নয়ন-ধার—
পাইয়াও যেন পাইনে তোমারে—তাহা এই বেদনার।
'আমি কি নিঠুর?' সে মোরে শুধাল, আমি কহিলাম, নয়;
ফুলেরো আঘাত পাছে লাগে যার, কে তারে নিঠুর কয়!
অমনি যাহারে মমতা বেঁধেছে হয়ত ভালোর তারে,
তাহার কোমল ফুলের অধরে কোন ব্যথা দিতে পারে।

দুইটি বাহুর তরে,
ও দেহ-তরুর অস্ফুট কুসুম যদি পড়ে যায় ঝরে!
যে মোরে দিয়েছে এই এত জ্বালা এ কথা ভাবিবে যবে,
রোষ-তেজোদণ্ড ভেঙে পড়ে যেন আমার মাথায় তবে।

তবে কেন কাঁদ? হায় অভাগিনী! জীবনের ভোরখানি
কার হেলা পেয়ে আজিকে এনেছ মরণের দেশে টানি!
আমি কহিলাম, সোনার বন্ধু! এ মোর ললাট-লেখা,
কেউ পারিবেনা মুছাইয়া দিতে হৃদয় গভীর রেখা।

মাথার পসরা খানি,
মাথায় লইয়া চলিতে হইবে সমুখে চরণ টানি।
এ জীবনে কেউ দোসর হবে না, নিবেনা করিয়া ভাগ,
এই বুক ভরি জমায়েছি যত তীব্র বিষের দাগ।

তবু বলি সখা! কেন কাঁদি আমি, তোমারে দেখিয়ে মোর,
কেন বহে যায় শাওনের ধারা ভাঙিয়া নয়ন দোর।
আমি কাঁদি সখা, তুমি কেন হেথা মানুষ হইয়া এলে,
বিধির গড়া ত সবই পাওয়া যায়, মানুষেরে নাহি মেলে।
আকাশ ধরেছে শ্যাম-ঘননীল বুকের নবীন মেঘে,
সন্ধ্যা সকাল প্রতিদিন তার নব নব রূপ দেখে;
যত দূরে যাই তত দূরে পাই কেউ নাহি করে মানা,
কেউ নাহি পারে কাড়িয়া লইতে মাথার আকাশখানা।

—বিধাতা গড়েছে সুন্দর ধরা, কাননে কুসুম-কলি,
কোলে কোলে তার পাখি গাহে গান, গুঞ্জরে মধু অলি।

বাতাস চলেছে ফুল কুড়াইয়া পাখায় জড়ায়ে ধুল,
যারে পায় তারে বিলাইয়া যায় ফুল ঈশ্বরের দান।

তটিনী চলেছে গাহি—
তার জলে আজ সম-অধিকার, কারো কোন বাধা নাহি।
শুধু মানুষেরে পায়না মানুষ, নাহি করা অধিকার,
মানুষ সবারে পাইল এ ভবে, মানুষ হলনা কার।
কেন তুমি সখা! মানুষ হইলে, অতটুকু দেহ ভরি,
বিশ্ব জোড়া এ রূপ-পিপাসারে কেন রাখিয়াছ ধরি।
আমি কাঁদি সখা! কেন তুমি নাহি আকাশের মত হলে,
যেখানে যেতাম তোমারে পেতাম, দেখিতাম নানা ছলে।

আকাশের তলে ঘর,
যারা বাঁধিয়াছে তাদের তৃষ্ণা অমনি বিপুলতর;
তুমি কেন সখা! কানন হলে না, ফুলের সোহাগ পরি,
রঙিন তোমার দেহ-নীপখানি পুলকে উঠিত ভরি।
বাউল বাতাসে ভাসিয়া যেতাম তোমার ফুলের বনে,
অনন্ত-তৃষা মিটায়ে নিতাম অনন্ত-পাগলা মনে।

কেন তুমি সখা! মানুষ হইলে! সীমারে বরণ করি
অসীম ক্ষুধারে সীমার বেড়ার বাহিরে রেখেছ ধরি।
তুমি কেন সখা! এমন হলেনা—যত দূরে যাইতাম,
আকাশের মত যত দূরে চাহি তোমারেই পাইতাম।
আমি অনন্ত, আমি যে অসীম, অনন্ত মোর ক্ষুধা—
বিপুল এ দেশে ভাসিতেছ তুমি একটু সীমার সুধা।

যাহে যে মানুষ হয়।
কেমন করিয়া পাব তারে, যারে ধরা-ছোঁয়া নাহি যায়;
আমি কাঁদি কেন সুন্দর সখা! তোমারে বলিব খুলি
এই বেদনায়, কেন তুমি এলে মানুষ হইয়া ভুলি?
যে মানুষ এই ধরারে দেখিছে নীতির চশমা পরি,
যার যাহা পায় তাই লয় সে যে পাল্লায় ওজন করি।
জগৎ জুড়িয়া পাতিয়াছে যারা মনুসংহিতা বই—
আমি কাঁদি সখা! আর কিছু নও তুমি সে মানুষ বই!

জগতের মত ভাবি—
চোখ বেঁধে যারা ধরারে দেখিল তাহাদেরি নাম জারি।
বাহিরে হাসিছে নীতির জগৎ, অন্তরে আড়ালে বসি,
কীরূপ উত্তরে উলঙ্গ নর পরি শাসনের রশি।
সে বলে যে আমি না-ভাল-মন্দ, আমি নর—নারায়ণ,
মত্ত শক্তিরে বাঁধিয়া রেখেছে সংস্কার বন্ধন।
আমি কাঁদি সখা; আমার মাঝারে আছে সে আমার আমি,
মোর সুখে দুখে মন্দ-ভালোয় সুনাম-দুর্নামে নামি;
এ-জগতে কেউ চাহিল না তারে; এ মোর পসরাখানি,
যারে দিতে যাই সেই ফিরে চায় হেলায় নয়ন টানি।

জগতের হাটে তাই—
সে মোর আমারে খণ্ড করিয়া দোকানে বিকায়ে যাই।
কেউ খুশি চায়, কেউ ভালবাসা, কেউ চায় মিঠে-কথা,
কেউ নিতে চায় নয়নের জল, কেউ চায় এর ব্যথা।

পসরার ক্ষেতে একেলা কৃষাণ বীজ ছড়াইয়া যাই,
কোথা পাপ কোথা পুণ্য ছড়ানু, কোন কিছু মনে নাই।
আমি কাঁদি সখা! হাটে-বেচা সেই খণ্ড আমারে হায়,
যারে ভালবাসি—তাহার পূজায় কেমনে আনিব ধরে।
হায় হায় সখা! তুমি কেন হলে হাটের দোকানদার—
খণ্ড করিয়া চাহ যারে তুমি পূর্ণ চাহনা তার?
সব কথা মোর শুনে সে কেবল কহিল একটু হাসি—
মোর যত কথা কব একদিন, আজকের মত আসি।

পায়ে পায়ে পথে যতদূর গেল, নিমেষে রহিনু চেয়ে;
সন্ধ্যা আঁধিয়ে কলস ডুবাল সাঁঝের রঙিন মেয়ে।
শূন্য চরের যতেক বাতাস রাতের কাহেলী কেশ,
নাড়িয়া নাড়িয়া হয়রান হয়ে ফিরিল উষার দেশ।

কতদিন গেল, কত রাত এল অজুর বসন পরি,
চলে জল-নদী বরণে বরণে বরষের পথ ধরি।
আজো বসে আছি এই বালুচরে, দুহাত বাড়িয়ে ডাকি,
কাল যে আসিল এই বালুচরে, আজ সে আসিবে নাকি?

প্রতিদান

আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
যে মোরে করিল পথের বিবাগী,
পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি;
দীঘল রজনী তার তরে জাগি ঘুম যে হরেছে মোর,
আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর।

আমার এ কূল ভাঙিয়াছে যেবা আমি তার কূল বাঁধি,
যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাঁদি;
সে মোরে দিয়েছে বিষে ভরা বাণ,
আমি দেই তারে বুকভরা গান;
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম ভর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।

মোর বুকে যেবা কবর বেঁধেছে আমি তার বুক ভরি,
রঙিন ফুলের সোহাগ-জড়ান ফুল মালঞ্চ ধরি।
যে মুখে সে কহে নিঠুরিয়া বাণী,
আমি লয়ে সখি তারি মুখখানি,
কত ঠাঁই হতে কত কি যে আনি, সাজাই নিরন্তর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।

পরাজয়

আগে ত জানিনি আমি,
এমনি করিয়া কাঁদিয়া কাটিবে আমার দিবসযামি;
ফুল তুলেছিনু মালা গাঁথিবারে, ফুল পর চাহি নাই,
ধূপ জ্বেলেছিনু গন্ধ শুঁকিতে অগ্নিরে কেন পাই?

কেন ভুজঙ্গ জ্বালা
চন্দন বলে কপালে লেপিতে কপাল হইল কালা!
কেন বারি মাগি তড়িৎ পাইনু, হায় পিপাসিত পাখি!
তোর তৃষ্ণার জলেতে আজিকে কে গেছে অনল রাখি!

কাঁটার পথেও চলিয়া দেখেছি, কাঁটা লাগে নাই পায়,
ফুলের পথে যে চলিতে আজিকে আঘাত সহন দায়।
পাথর ভেঙেছি, কানন কেটেছি, বাজেরে লয়েছি শিরে,
ফুলের আঘাতে আজিকে সজনী! হারানু পরানটিরে।
আকাশ হইতে তারারে আনিয়া পরেছি তারার মালা,
পূর্ণ-চাঁদের কলসি নাড়িয়া কুটির করেছি আলা।
দূর গ্রহপথে ভাসাইয়া দিয়া গানের আলোক-তরি,
কত ছায়া-পথে ছায়া-বধূদের লয়েছি বরণ করি।

কত ঝোড়ো রাতে বাদলের সাথে মেঘেতে বাজায়ে ঢোল,
বিজলীর লতা আকাশে বাঁধিয়া খেলেছি আলোর দোল।
সেই আমি আজ তব ফুলবনে মানিলাম পরাজয়,
মাকড়ের আঁশে হাতিরে বাঁধিলে এই বড় বিস্ময়।

কবির সমাধি

[বনের ধারে নদীর তীরে কবির কুটির। একদিন মালিনীর মেয়ে মালতীলতিকার সঙ্গে তার ভাব হয়ে গেল। প্রেমের প্রথম উচ্ছ্বাস একে অপরকে ভালবাসে। শেষে মালিনীর মেয়ের আর কবিকে ভাল লাগে না; কবির দুঃখ সে বুঝতে পারে না।]

মালিনীর মেয়ে আসে নাই কাল, আজও নাই তার সাড়া,
ঘরে বসিয়াও কবির পরান হইয়াছে ঘর-ছাড়া;
দূর বালু-পথ আঁধারে মুছায়, ধূলার বসন পরে;
দখিনের বায়ু গড়াগড়ি যায় তাহার বুকের পরে।
ওই বালুর মুকুরে ঢালিয়া বুকের আগুনরাশি,
দুপুরের রোদ যখন ফিরিয়া হাসিছে বিকট হাসি।

আজো কি তাহার সময় হবেনা, আজো এই নদী-তীর
বালুর আখরে ছবি আঁকিবে না তাহার চরণটির।
দূর দিগন্তে মেলি দুই বাহু ডাকে কবি, আয়—আয়—
এই নদীপথে সেই সুর যেন বালু হয়ে উড়ে যায়।
ক্রমে দিন যায়, সন্ধ্যার কোলে রঙের আলো বুঝি,
পশ্চিম তীরে হাসে কল-কল দিবস শেষের খুশি।

নদীপথ বেয়ে পথিকেরা চলে, তাহাদের পদঘায়
কবির পরাণ ধূলায় মিশিয়া গুঁড়া হয়ে যেন যায়।
এই পথ দিয়ে কতলোক আসে, তার কি আসিতে নাই—
এ পথে কি কেউ কাঁটা গাড়িয়াছে সে আসিবে বলে তাই।
দূর পশ্চিম এখনও হাসিছে দিকবলয়ের মালা,
সন্ধ্যাবধূরা প্রদীপ জ্বালায়ে তাহাতে করেছে আলা:

সেই কালে কবি হেরিল সমুখে, আসে মালিনীর মেয়ে,
এলোচুল হতে শিথিল কুসুম পড়িতেছে পথ বেয়ে;
দুটি বাহু তার হেলিছে দুলিছে, উড়িছে সুনীল শাড়ি,
অঙ্গে অঙ্গে বাজিছে গহনা সারা দেহ তার নাড়ি;
—এমনি করিয়া মেঘ-পথ বেয়ে হাসে বিজলীর লতা,
—বহে কাল জলে ডুবিতে ডুবিতে সোনার কলসি যথা;

কবি শুধু তারে চাহিয়া দেখিল, যেন দুটি আঁখি ভরি,
সারা দেহে তার যত রূপ আছে লইল উজাড় করি।
মালিনীর মেয়ে হাসি মুখে তার আরো মাখাইল হাসি—
কহিল, আজিকে দেরি করে দিল রাজার কুমার আসি।
তাহাকেও আমি সাজিয়া গুঁজিয়া আসিনু তোমার কাছে,
এমন সময় রাজার কুমার ডাক দিল মোরে পাছে।

সেকি ছুঁড়ে মেয়ে—দিতে হবে তারে বিনা-সুতে গেঁথে মালা
এমনো নয়কো তেমনো নয়কো সে এক বিষম জ্বালা।
খানিক তাহার গাঁথিল ফুলের, খানিক বকুল ফুল;
তার মাঝে মাঝে গোলাপ গাঁথিতে নাহি হয় যেন ভুল।

সে মালায় পুন লিখিতে হইবে রাজার ছেলের নাম—
কি করিব আমি, সারা রাত জেগে তাই শুধু গাঁথিলাম।
আজ এসেছিল মালা লইবার —পেয়ে সে কি খুশী তার।
বলে, সে এমন বিনা-সূতি মালা কভু দেখে নাই আর।
তাহার গলার গজমতি হার আমারে দিয়েছে ডেকে,
তোমারে দেখাতে আসিলাম তাই এই দিকে ঘর থেকে।
এখনি আবার ফিরে যেতে হবে, আজিকে নূতন করে,
সারা রাত জেগে রাজার ছেলের মালা দিতে হবে গড়ে।

কবি কহে, শুন মালিনীর মেয়ে, আমিও গেঁথেছি মালা,
কথায়-কথায় সুর গাঁথিয়া তোমারে পরাতে বালা!
যে কথা আমার গোপন মনের আঁধার গুহার কোনে,
হাজার বরষ ঘুমাইয়াছিল নিশার স্বপন-সনে
আজিকে যে বুক বেদনার ঘায়ে সে কথারে ছিঁড়ে আনি,
আঁখি-ঝিনুকের জল ঝালে ধুয়ে গেঁথেছি মালাখানি;
মালিনীর মেয়ে হাসিয়া কহিল, এ সব ত শুনিলাম,
আচ্ছা বল ত, তোমার মালায় লিখিয়াছ কার নাম?
কবি কহে, সখি, কি লিখেছি আমি তোমারে বলিব খুলে,
আকাশেতে যেন আকাশের তারা ধরায় নামে কি ভুলে!
উষার কিরণ তড়িতের লিপি তুলিয়া নিয়াছি তাই,
মালিনীর মেয়ে মালতি লতিকা তারো নাম লিখি নাই;
এ মালায় আমি লিখিয়া রেখেছি তোমার ও চাঁদমুখ,
ওই বদনীর মনুষের মনে দিতে পারে কত দুখ;

ও দেহ-তরণী বাহিয়া চলেছে যৌবন নদীর জলে,
আঘাতে তাহার যত ঢেউ উঠে লিখেছি মালার দলে।
আর লিখিয়াছি, ওই অধর ভরে তোমার কথাটি খুশি,
রাতের তারারে সান্ধ্য মানিয়া আসিয়া সে কিসমতি;
অজানা গ্রহের দূর পথ বেয়ে চলে গেছে মুসাফির,
তারা দেখে গেছে কি বেদনা মোর একেলা পরাণটির।
সেই সব আমি মালায় লিখেছি, আরো লিখিয়াছি তারও—
আরো যে আঘাত হেনে যাবে তুমি আমার জীবন পারে।

এ মালায় মোর কি হইবে কাজ? মালিনীর মেয়ে কয়,
কবি কহে, সখি! বেদনার দান জগতে যে অক্ষয়।
তুমি কি জান না, তোমার বিধাতা তোমারে পাঠাল ভবে,
এই কথা বলে—ও দেহের রূপে জগত জিনিতে হবে।
তোমার গলায় মোর মালাখানি এ যে তব জয়-হার,
ও রূপে তোমার কত মোহ আছে, ভাষা এ যে সখি তার।
মোর মালাখানি লয়ে যাও সখি! মহাকাল নদীজলে,
রূপের তরণী করে টলমল ঝঞ্ঝার হিল্লোলে।
ওই তব হাসি ওই রাঙা মুখ, ও যেন সোনার পানা,
আজ যারে দেখি কালকে তাহারে অমনি দেখিতে মানা।
আমি যেন আজ দেখিতেছি সখি! তোমার ও রূপখানি।
তটিনীর মত ছুটিয়া চলেছে কূলে কূলে বাধা হানি।
ও তব দেহের কান্তি জুড়িয়া নাচিছে কালের ঢেউ,
আজ যারে দেখি কালিকে তাহারে হেন দেখিবে না কেউ।
কি জানি কখন এই কথা হয়, ও তব মুখখানি,
বছরের কোন দৈত্য আসিয়া লয়ে যায় কোথা টানি;

তখন সজনী সেই-বালুচরে খুলিয়া আমার মালা,
দেখিও, যা তুমি হারায়েছ পথে—কত সে হাসিত ছলনা।
ও দেহের সেই তনু দেউলে এ মোর মালাখানি,
বিগত দিনের মত ভোলা কথা আনিবে সেদিন টানি।
তখন হাসিয়া এই মালারে পড়ে যাবে তব মনে,
ফেলিও সজনী! একফোঁটা জল ও দুটি নয়ন-কোণে।
এই আশা লয়ে আজো বেঁচে আছি, বুকে করাঘাত হানি;
ভাবি, সাথে সাথে ছিঁড়ে যায় নাকি গোপন বেদনাখানি।

মালিনীর মেয়ে শুধাইল, কবি! বুঝাইয়া বল মোরে,
শুধু কি বেদনা রাখিয়াছ আজ তোমার মালার তরে?
শুধুই বেদন, কবি কহে কৈসে নিছক বেদনা সখি,
এ পোড়া নয়নে আর কিছু নয় বেদনায়ে শুধু লখি।
কেন ব্যথা পাও, মালিনীর মেয়ে কহে আরো কাছে এসে,
কবি কহে, সখি, কপালের লেখা, এ যে তোমা ভালবেসে।
এ জীবনে যারে ভালবাসি সেই সব চেয়ে দেয় দাগা,
তাহা যাহারে দিলাম সেই করাইল দুর্ভাগা।
তবু তাঁর হাতে দিলাম তুলিয়া, সে নিঠুর মোরে আজি,
ধরণীর ঘাটে সাজাইয়া দিল শূন্য নায়ের মাঝি।

কেন আমি তব কি করেছি কবি? সুধায় মালিনির মেয়ে,
কবি কহে, কেন তড়িত হইয়া এলে মোর মেঘ বেয়ে?
দেশে দেশে আজ শুধাই কাঁদিয়া তোমারে খুঁজিয়া মরি,
তাঁর ব্যথায় আগুন জ্বালিছে মোর বুকখানি ভরি।
ধরিতে ধরিতে পালাইয়া যাও, যাবার বাঁধন হয়—
এত যে নিখিল ভালবাসিবার আসে যদি জানা যায়।

যদি জানা যায়—যারে কাছে চাই সেই হয়ে যায় দূর,
তবে কেহ কভু কয়ো কথা দিয়ে বাঁধিত গানের সুর?
এ মোর নিখিলে এ বাঁধন সখি, জুড়াবার নাহি ঠাঁই,
যারে ভালবাসি সেই দিল মোরে সব চেয়ে বেদনাই।
তাই দিয়ে আমি গাঁথিয়াছি মালা, তারি আঁকিয়াছি ছবি,
মালাপতি হয়ে কোথা পাব সখি, আমি যে তোমার কবি।

হায় হতভাগা, মালিনীর মেয়ে কহে তার হাত ধরি,
যে ব্যথারে আমি চিনিনে এ তবে তারে লয়ে কিবা করি?
মালিনীর মেয়ে ফুল লয়ে খেলি, ফুলে-ফুলে দিবি হার;
ফুলের দেশে ত হাসি আছে সদা, বেদনা নাই যে তার।
মোর ফুল-বনে ফুল বিছাইয়া ঘুমাই ফুলের গায়,
সন্ধ্যা-সকালে শুধরি একলে গন্ধ ছড়াই বায়।
ফুলের সাথে শিখিয়াছি সখা, কেবলি ফুলের হাসি,
সে দেশ আজিকে কেমনে লইব তোমার ব্যথার বাঁশি।
এ জীবনখানি মধুর পেয়ালা দোলে তরঙ্গভরে;
লহরে লহরে সোনার স্বপন ভেসে ওঠে ধরে ধরে।
এরি সাথে যারা মনের বীণাতে বাঁধিতে পারে না সুর,
চরণের ঘায়ে তাহাদের মোরা ছিটাইয়া করি দূর।

কবি কহে, ওগো ফুলের কুমারি! ফুল লয়ে তুমি থাকো,
সে ফুল যে সখি! ঝড়ে পড়ে যায় তারে তুমি দেখনাকো?
ফুলের হাসি যে দুদিনে শুকায় কোটি ফুল হয় বাসি
এই কথা শুনি তোমাদের দেশে বাজে নাই কোন বাঁশী?

যে ফুল তোমরা অলকে বাঁধিছ, যে ফুলে গাঁথিছ হার,
তোমাদের দেশে কোন দাম নাই সে ফুলের বেদনার!

নয়! নয়! নয়! মালিনীর মেয়ে কহে পুনরায় হাসি,
প্রতিদিন মোরা উঠাইয়া দেই পথে ঝড়া ফুলরাশি।
আমাদের দেশে শুধু হাসি সখা— যার ক্রন্দন থাকে,
পথের ধুলায় ফেলিয়া আমরা পায়ে দিয়ে যাই ওকে।

তবু-তবু—ওগো সোনার বরণী আমারে করুণা করি,
মরণে মরণে শুধু দেখে যেয়ো মোরে ব্যথায় যদি না মরি।
সময় কোথায়? মালিনী শুধায়, চলিয়াছে ভাটির বেলা
এই মাঝে সখা। সেরে নিতে হবে জীবন–হাটের খেলা।

কারে অভিমান

কারে অভিমান হায়রে হায়রে পরাণ, জীবনের সাহারায়,
কারো ব্যথা কেউ ভাবিয়া দেখিতে সময় নাহিক পায়।
যার পাছে পাছে ফিরিলি কাঁদিয়া
সে ত কভু তোরে দেখে না চাহিয়া;
শুধু দিয়ে গান গাহিয়া গাহিয়া, বাড়ালি বুকের জ্বালা,
আপনার হাতে গাঁথিয়া পরিলি দহন-বাণের মালা।

পরের পরাণ লইয়া উহারা করিতেছে ছেলেখেলা,
ভালবাসাবাসি উহাদের কাছে আপন হাতের ঢেলা।
ওরা জানে যাহা মুখের মায়ায়,
নিখিল হৃদয়ে পায়ে দলা যায়;
তোর অভিমানে, কিবা আসে যায়,—তোরি মত শত শত,
ওদের একটু কৃপার লাগিয়া পথে পড়ে আছে কত।

জীবনের দাম উহাদের কাছে একটু শুষ্ক হাসি,
একটু চাহনি—তারি বিনিময়ে ভালবাসা রাশি রাশি।
একটু করুণা, একটু আদর,
ওরা জানে তার কতটা কদর;
মানুষের মায়া বৈভব, ওরা তারি বিনিময়ে,
ছিনিমিনি খেলা করিতেছে নিতি পরের পরাণ লয়ে।

উহাদের হাটে উহারাই রাজা, নিয়ম তাহার এই,
বিনামূল্যে যাহা বিকাইতে পার,—কিনিতে ক্ষমতা নেই।
        বসিয়া কখনো কল্পনা করিয়া,
        কারো কাছে কিছু ফেলেরা বেচিয়া,
হৃত না লইতে হায় তা উবিয়া, দুঃখের ফেনার প্রায়
কুয়াসার শাড়ি অঙ্গে না দিতে বাতাসে মিলিয়া যায়।

হাটেতে উহারা বেসাতি করিছে বেলোয়ারি চুড়ি লয়ে,
ক্রেতারা আসিয়া ভিড় করিয়াছে মানিকের বোঝা বয়ে।
        একটু সে কথা, আমি ভালবাসি,
        তারি মোহে গেছে কত প্রাণ ভাসি,
মুকুতা রতন কত রাশি রাশি, পড়েছে চরণ তলে;
ওরা যা দিয়েছে কর্পূর মতো, ধরিতেই গেছে গলে।

কাজ নাই তোর—কাজ নাই ওরে, এ হাটে দোকান বাঁধি,
মিছে কেন আর কাঁদিয়া বেড়াস মানুষেরে মন সাধি?
        এমন পাষাণ কে আছে কোথায়,
        নদী স্রোত সনে মিতালী পাতায়?
মানুষের মন ভরে আপন খায়। শিশু ডাক নাহি শোনে।
—কবে কে কোথায় পিরীতি করেছে মানুষে মানুষ সনে?

তবু যে তাহারে ভুলিতে পারিনে; আয় তবে মাটি লয়ে,
তারি মত এক মাটির মানুষ গড়ে লই দেবালয়ে।
        মাটির দেবতা লবে পূজাভার,
        নাই যদি লয়, হেলা নাই তার,
আসিবে না কভু পায়ে দলিবারে জীবনেরে অকাতরে,
মাটির মানুষ গড়িয়া তাহারে পূজিব মাটির ঘরে।

হায়রে পরাণ—মাটির পরাণ; কোথায় লুকাবি মুখ,
এমন দরদি কোথা ফিরে নাই স্নেহ ভরা যার বুক?
        আকাশে বাতাসে কেন কোন ঠাঁই,
        পথের লোকের কেহ ফিরে নাই।
এত ভালবাসা কারে দিয়ে যাই—কারে গলাগলি ধরি,
শূন্য বেণুর এতগুলি ফাঁক গানে গানে দেই ভরি।

তোমারে ভুলেছি আজ

[প্রথম স্তবক]

তোমারে ভুলেছি আজ
সারাদিন বসি তোমারে ভাবি, ভাবি ও পড়েছে কাজ।
সকালে উঠিয়া বেড়াইতে যাই, নদীটির তীরে যাই,
সেইখানে তুমি নিতুই আসিতে, হাসি যে থামে না ছাই;
সেই কবে তুমি রাঙা পাও মেলে এসেছিলে নদী তীরে;
সে পায়ের রেখা কবে মুছে গেছে ভরা বরষার নীরে;
সেথা যে এখন ঘন কাশবন, তুমি ভাবিয়াছ বুঝি,
সেই কাশবন দু'হাতে সরায়ে তব পা'র রেখা খুঁজি।
বলাই পড়েছে, আমি সেথা রোজ এমনি বেড়াতে আসি,
কাশের পাতায় শিশির জড়ান, তাতে রোদ যায় ভাসি।
প্রথম রবির সিঁদুরিয়া রোদ, তোমার রঙিন ঠোঁটে,
কতদিন আমি দেখেছি এমনি রাঙা রাঙা হাসি ফোটে।
তাই বলে আমি তোমারে ভাবিনে, কাশের ক্ষেতের পরে,
কাঁচা-পাকা ধান আজোরে ঘুমায় কেঁপিও স্মরণ করে।

সারারাত তারা স্বপনে দেখেছে, জোছনায় পাও মেলি,
বক্ষে তাদের রাতের শিশির জোছনায় গেছে খেলি।
তোমারি পায়ের রঙখানি যেন সেই ধানক্ষেতে পাতা,
তাই বুঝি আমি সেইখানে যাই। এমনি হয়েছি হা-তা।

সেইখানে বসি দুখানি লতায় কলমির ফুল বাঁধি,
আজো মনে আছে, কবে দিয়েছিনু তোমার খোঁপায় সাধি।
আজো মনে আছে—সেই কবে তুমি মল্লি-ধান খুঁটি,
কানে পরেছিলে, হাতে বেঁধেছিলে দু-একটি তার ঝুঁটি।
আজো কি আমার স্মরণে রয়েছে বলেছিনু সেই কবে,
এখন সাঁঝেতে যে দেখিবে তোমায়, হৃদয়ের রাণী করে।

ভুল-ভুল সখি, ওসব ভাবার অবসর নাহি আর,
পারিনে এমন সময় কাটাতে কথা লয়ে যত তার।
বিকালে কেবল বেড়াইতে যাই—নদীর তীরেই যাই,
সেখানেতে বুঝি তুমি ছাড়া আর কেহ কভু আসে নাই?
সেই পথ দিয়ে কত লোক চলে—সেই চলা-পথ হয়ে,
চলে মহাকাল দিন-রজনীর আলো-ছায়া পাখা-ভরে
চলে কত রবি, চলে কত চাঁদ—চলে কত গ্রহতারা
রেখা-লেখাহীন অনাদিক পথে হইয়া আপনহারা।
দিক-বলাকার বলয় ঘিরিয়া নির্দেশ পথ-নাশ,
ঘুমায়েছে আজো—যারে পরশিল না কাহারো পায়ের দাগ।

সেই পথ দিয়ে তুমি এসেছিলে, ফুলতনু রঙখানি
উজারে যাইত ভাবিয়াছ, সেথা গেছে ফুলরেখা টানি।
ভাবিয়াছ, তব পায়ের গন্ধ উড়েছিল বায়ুভরে,
সবটুকু তার রাখিয়াছি আমি মোর উরজি ভরে।

—আজো সে শঙ্খ হারাইয়া দিয়ে শাঁখের উতল বায়,
এই বালুচরে একেলা আমার সময় কাটিয়া যায়?
মিথ্যা সজনী—মিথ্যা এ সব, নিজেরেই লয়ে মরি,
নিজেরেই মোর সান্ত্বনা দায় পরেরে কখন স্মরি!

দূর পশ্চিম গগনের কোলে নানান মেঘের মেলা,
তারি পরে বসে নানান বরণ রৌদ্রের হাসিখেলা;
সে হাসি আবার ভরিয়া পড়েছে কতক নদীর জলে,
নদী ও আকাশ দুলে লাল হাসে ধরিয়া এ-ওর গলে।
তুমি ভাবিয়াছ, সেথায় পড়িয়া রঙের ইন্দ্রজাল,
তোমারে ধরিতে রোজ সন্ধ্যায় একেলা কাটাই কাল?

তুমি বুঝি ভাব ওই যেখানেতে দুলিতেছে কাশবন,
সেখানে বসিয়া কত কি ভাবিয়া কাঁদি আমি সারাখন।
আমি বুঝি ভাবি, সেই কবে তুমি ধরিয়া আমার কর,
বলেছিলে, এই ভালবাসা মোরা রাখিব জনমভর।
কাশের পাতায় মোর হাতখানি বাঁধিয়া তোমার হাতে
এই বাঁধন অটুট রহিবে বলেছিলে নিরালাতে;
আরো বলেছিলে এই কাশপাতা যদি বা ছিঁড়িয়া যায়,
মনের বাঁধন মনেই রহিল টুটিতে দেব না তায়।
আমি বলেছিনু, শোনরে বন্ধু, বড় ভয় করে মোর,
হৃদয়ের রাতি ঘুম না ভাঙিতে হয়ে যায় যে গো ভোর।

শিয়রে প্রদীপ জ্বলিতেই থাকে, রজনী সে হয় বাসি,
এদেশে সে সখি। বাসরের রাতে বাজে বিদায়ের বাঁশী।
তুমি বলেছিলে, যদি-বা কখনো রজনী পোহাতে চায়,
এ দুটি কোমল বাহুর বাঁধনে ফিরায়ে আনিব তায়।
আমি কয়েছিনু, শোনগো সজনী, তবুও মোর ভীরু হিয়া,
বড় ভয় করে, বঁধুয়া তোমারে আর কেহ যায় নিয়া।
পদে পদে মোর কত অপরাধ, হয়ত মনের ভুল,
যদি কোনদিন এ ফুলতনুতে কোন ব্যথা দিই ভুলে;
তখন কি তুমি মোরে ছেড়ে যাবে? শোন ওগো মনোরমা,
সেদিনের সেই অপরাধ হতে করিবে আমারে ক্ষমা?

(দ্বিতীয় স্তবক)

তুমি সুন্দর। জগতে জুড়িয়া পূজামন্দির পাতি,
মন্ত্রে মন্ত্রে ডাকিতেছে তোমায় পূজারিরা দিবারাতি।
মোর এই দেহে হৃদয়ের পূজা বাতাসে ভাসিয়া পড়ে,
যদি কোনদিন আর কোনো গান লাগে এসে তব কানে,
এ মোর দেহের নানান ছিদ্র, যদি তারি পথ বেয়ে
আর কোনো কারো সুর কেঁদে আনে কাহারো হৃদয় ছেয়ে,
তখন কি তুমি মোরে ছেড়ে যাবে? তুমি বলেছিলে, হায়,
অধিক ভয়ের সেতুর বাঁধিয়া ঠেকায়ো না আপনায়।
তোমার ঘরের যত ছিদ্র আমি বুকের আঁচল চিরে,
এমনি করিয়া বাঁধিয়া রাখিব মায়ামমতায় ঘিরে।
আর কারো গান পশিবে না সেথা, শুধু তুমি আর আমি,
তার সাথে সাথে রহিবে সাক্ষী দীর্ঘ দিবস-যামি।
তুমি ভাবিয়াছ, সে দিনের সেই তরুণ ফুলের মাঠ,
এইসব কথা হতে লিখিয়া আজিও করিছ পাঠ।

সেদিনের সেই শুকনো নদীরে সাক্ষী মানিয়া হায়,
সেই সব কথা বলেছিলে তুমি প্রাণ করিব তায়।

আজিকার নদী সে নদীতে নাই যদিও বরষা শেষ,
তবু এর বুকে লেখা নেই সখি, সে সবের কোন লেশ।
সেদিনো এমনি দুলেছিল সখি, শূন্যের নীল মায়া,
—তবু এ আকাশ সে আকাশ নয়, এর বুকে মেঘছায়া।
সেদিনো এমনি হিন্দোল বাতাস—আজিকার মত নয়,
—এ যেন কি ব্যথা সহিতে না পেরে কাঁদিছে ভুবনময়।
এই বালুচর—একি সেদিনের? হায়! হায়! সখি হায়!
কি ব্যথারে এ যে গুঁড়া করে আজি উড়িছে উতল বায়।
এরা কেউ তার সাক্ষী হবে না—নাই তারো প্রয়োজন,
তুমি যদি মোরে ভুলে গেলে সখি, মোর ভোলা কতখন।

তোমারে আজিকে ভুলে গেছি আমি, বক্ষে নখর হানি,
ভাবিতেছি হায়, ছেঁড়া যায় নাকি ব্যথাভরা মনখানি।
সারা দেহে আমি বালু মাখিতেছি, বালুর কঠোর ঘায়,
দেখি যদি এই জীবন হইতে কারো স্মৃতি মোছা যায়।
রাতের কালিরে মুঠি মুঠি ধরে সারা গায়ে বসে মাখি,
মনে হয়, এরি কুহেলি বসনে ব্যথারে লুকায়ে রাখি।

তুমি ভাবিয়াছ, তোমারে ভাবিয়া রাতে ঘুম নাই মোর,
শিয়রে প্রদীপ জ্বালিতেই থাকে আমার হয় না ভোর।
মিথ্যা এসব, কলাবন ধরি রাতের বাতাস কাঁদে,
বাঁকা চাঁদ তারে ধরিবারে চায় জোছনার মায়া-ফাঁদে।

রাতের বিরহী ঝিঁঝিরা বাজায় যে-ঘুম বুকের কথা,
তারি সাথে যেন তাল ঠোকে কাঁদে—এ বুক মাটির ব্যথা।
তারি সাথে সাথে মন ভেসে আসে কবরের মাটি ফাঁড়ি,
সেই সুরে সুরে আজিও আমার বুকের ব্যথারে ছাড়ি।

এই কবরীর কঠোর মাটির স্তর-তল বুকে নিয়া,
অনন্তকাল এ মাটির সনে কেঁদেছে যাদের হিয়া,
সেই সব মৃত সাথীদের সনে কানাকানি করি রোজ,
আরো অতিশয় উঁচু ব্যথারে একা আমি করি খোঁজ।
তাই রাত কাটে। আমি আছি আর আছে মোর এই ব্যথা,
নাই—নাই আর অবসর নাই, ভাবিতে কাহারো কথা।

চিঠিগুলি তব বাক্সে ভরেছি। আঁটিয়াছি চাবি তালা,
তবু ভয় হয়, পাছে বা তাহারা খুলে বাহিরায় জ্বালা।
বারে বারে তাই খুলে খুলে দেখি, পড়ে দেখি বার বার,
যদি কোনো কথা কোনো ফাঁক দিয়ে হয়ে আসে কভু বার;
কাপড়ে জড়ায়ে বাক্সের ঢাকি, যদি তারা কোনো ফাঁকে,
ভালবাসি আমি হেন কোনো কথা মনে এসে রেখা আঁকে।

তুমি লিখেছিলে, চিঠির আখরে, তুমি লিখেছিলে মোরে,
প্রাণবন্ধু, তোমার ব্যথায় আমারো পরাণ ঝরে।
আরো লিখেছিলে, তুমি যদি সখা আমারে স্মরণ করি
এমনি করিয়া কাঁদিয়া কাটাও সারাটি জনম ভরি,
তোমার দেহেতে যে প্রদীপ আজি জ্বালিয়া কাটাও রাতি
তারে বলে দিও, মোর দেহে যেন জ্বলিছে যে-ঘুম বাতি।

আরো লিখেছিলে, যে প্রদীপ আজি বুকের ব্যথায় জ্বালি
তিলে তিলে হায় নিজেরে ধরিয়া আগুনে দিতেছে ঢালি,
তার জ্বালা দেখে পতঙ্গ সেও মরণ বরণ করে,
আমি ত মানুষ, তোমার ব্যথায় কি করে রহিব ঘরে।
আমি ভাবিতেছি এই সব কথা যদি আজ পাখা মেলি,
বাক্সের কোনো ছিদ্র বাহিয়া বাহিরেতে আসে ঠেলি।
—তাই বারে বারে তালা চাবি দিয়ে বেঁধেছি বাক্সটারে
এর কোনো কথা আর যেন কভু বাহিরে আসিতে নারে।

খুলিয়া খুলিয়া চিঠিগুলি পড়ি, যদি বা হঠাৎ করে,
এ সব কথার এক আধটি বা উড়ে যায় হাওয়া ভরে।
তাই বারে বারে চিঠিতে আঁকিয়া রক্ত-কালির রেখা।
কাগজের সাথে জমা করে বাঁধি—তোমার সে-সব লেখা।
তুমি ভাবিও না, সাক্ষ্য মানিয়া চিঠির কয়টি পাতা,
সারাক্ষণ আমি ভুল বকিতেছি আপনার মনে যা-তা।
—আমি তাহাদের লুকাইতে চাই, যেন কভু কোনোমতে,
সেই বিস্মৃত দেশ হতে তারা পারে না বাহির হতে।

আজিও না তুমি সময়ের ঘোরে হইয়াছে বাড়াবাড়ি,
প্রমাণ করিব চিঠিতে যা তুমি মিথ্যা করেছ জারি।
অবসর নেই : তুমি ভুলে গেছ আমিও ভুলিতে পারি;
—আমার দিবস রজনী কাটিছে ভুল গেঁথে সারি সারি।
তুমি ভুলে গেছ, হয়তো এমনি কাটিছে তোমার বেলা,
আলসে এলায়ে কবরি ফেলায়ে পাতিছ প্রাণের খেলা;
হয়ত অধরে আজিও আঁকিছ তেমনি সুঠাম হাসি,
সোনা তনু বেয়ে পথে পথে তারি ছড়াইছে রাশি রাশি।

হয়তো সে মুখ আজো উচ্চারে, ভালবাসাবাসি কথা,
হয়ত তাহারই জড়ায়ে তুলিছ কত পরিপাটি লতা।
এ সব তোমারে শুধাব না আমি অবসর নাহি মোর—
ভুলিয়া ভুলিয়া করিব যে আমি জীবন-আয়ুর ভোর।
তোমারে ভুলিব—যে আলো জ্বালিয়া স্মৃতিরে দাঁড়ায়ে রাখে,
আজিকে তাহারে রাখিয়া যাইব জীবনের পথ বাঁকে,—
সম্মুখে এখন নাচিবে আমার মরণের অভিসার,
আমি তার মাঝে বসিয়া গাঁথিব কেবলি ভুলের হার।

দুরাশা

শূন্য নদীর কূলে,
আমার বেদনা দুটি তট বেড়ি কাঁদিতেছে কূলে কূলে।
উতল বাতাসে পাখা নাড়িতেছে ব্যাকুল বেণুর শাখে,
কাশবন আজি গড়াগড়ি যায় সারা গায়ে ধূলি মেখে।
শ্যাম-রেখায় চক্র ভরিয়া বৃথা কাঁপে দূর বন,
সেই নির্মম তবু পড়িল না সবুজের বন্ধন।

ফিরে ঘুরে মরে চরের বিহগ শূন্যে হানিয়া ডানা,
সে দূর আজিও শাখার বাসরে আনেনি আকাশখানা।
বৃথা কেঁদে মরে মাটির ধরায় সবুজের আল্পনা,
কোমল বাহুর বাঁধন তাহারে আজো কেউ পারিল না।

বিদায়

আজিকে আকাশে মেঘ মেঘ মেঘ, বাতাস বহিছে ধীরে,
এসো সজনী, মোরা দুইজনে বসিগে নদীর তীরে:
ছোট মেয়ে নদী দুইধারে লিখি নতুন বনের লেখা,
জল-ঢেউ সনে গড়িয়া চলেছে বুকে আঁকি তারি রেখা।
চখা আর চখী গলাগলি ধরি ফিরিছে বালুর চরে,
বাতাস দুলিছে তারি সাথে সাথে দুপুর বসন ধরে।
দূর পশ্চিমে হেলিয়া পড়েছে অলস দিনের বেলা,
মেঘে আর রাঙা রঙে, আর মেঘে করে মেঘ-রঙ খেলা।
কূল কূলের মালাগাঁথি আজ উড়িছে গগন-গায়,
চরের পাখিরা ফিরিয়া চলেছে সুদূর নীড়ের ছায়।
দিগন্ত-জোড়া দূর বালুচর, নিঃঝুম নিরালায়,
তাহার উপরে অলস দিনের আলো-ছায়া ঘুমায়।
থাকিয়া থাকিয়া চরের বিহগ উঠিতেছে যেন মৃদু কোলাহল তুলি;
এসো সজনী এইখানে বসি মুখোমুখি দুইজনা,
এ-উহার পানে শুধু চেয়ে রব, কোন কথা বলিব না;
তোমার অধরে পড়িবে ঢলিয়া অলস দিনের আলো,
আমার মুখেতে ফুটেছে রাতের আঁধিয়ার কালো কালো।

আমি চেয়ে রব তব মুখ পানে, তুমি চেয়ো মুখ পানে,
আজও অনেক কথার মাঝে কথা কবে কানে কানে।
আমি চেয়ে রব তব মুখ পানে—রাঙা তব মুখখানি,
দুটি দুটি করি সন্ধ্যার আলো তাহাতে ছড়ায় আনি।
আকাশ হইতে ওরা ফুল ছিঁড়ে বাঁধিব তোমার কেশ,
শিশু ঝাউ এই বাবলা গাছ-খানি জড়াইব তব বেশে।

আজিকে সজনী, কেহ নাই হেথা শুধু আমি আর তুমি,
উপরে আকাশ, নীচে যে সবুজ তৃণ ঘেরা বালু ভূমি।
এইখানে আজি বসিয়া সজনী তব মুখ পানে চেয়ে,
দেখিতেছি যেন কত যুগ নাচে অতীত গগন ছেয়ে;
আজি মনে পড়ে, সেই কোনদিনে কিশোরী বালিকা বেশে,
এসেছিলে তুমি এই বালুচরে রাঙা মুখ মৃদু হেসে;
দুখানে তুমি জড়াইয়াছিলে নবীন ধানের ছড়া,
হাতে বেঁধেছিলে আঁচির ফুল ও কাঁকনেতে মাটির গড়া।
চলপথে যেতে দুপাশের মৃদু ফুল যেত ঝরে ঝরে,
তাদের ফুলটি মাটিতে নাচায়ে পড়িত অবাধে তারে,
আপনি তুলিয়া খোঁপুরে আদরে, পায়েতে পাড়িতে পারি;
আমি ভাবিতাম,—দুটি শুধু দুটি চোখে যায় বাঁশি বাজি
সেদিন আমারো কিশোর বয়স, শেখিনি সে মায়া-রাখি,
আমি সাজিলাম পথের রাখাল তোমার গাঁয়ের কবি।

আমার বাঁশীর সুর
সেদিনের সেই কাশ-সুবাসী ঝিঁঝির কাঁকন ছুঁড়ে
দূর-দেশ পথে যেখানেতে সাঝে চাঁদের কনক-রথ,
আমি বাঁশী সুরে সে দেশেতে ওরা গড়েছি সোনার পথ।

সেই পথ বেয়ে চলিত সে মোহ, চাঁদ-মাখা ঘরে ঘর,
রূপের নীচুর পরাইয়া যেত মণি-মানিকের হার।
মুখানি চলে জড়ায়ে পড়িত রেশমের মত কেশ
সে যেন আমার কুঁড়ো ঘরে যেত কিশোরীর আলো বেশে;
চলিত সে বেয়ে, চলিত সে তার রেখা লেখা পথ ছাড়ি,
যেখানে অবাই নীল পাথরের গগন-গায়ের শাড়ি।
সেখানে সে এসে দুয়ারে পড়িত আলু-থালু কেশ-পাশ,
বাতাসে তাহার অধরে অধরে ফুলের-ফুল-বাস।
সমুখে আহার ছিটিত আসিতো বরণ বরণ সাজ;
বরনে বরনে আসিত উজলী মাখিয়া সিঁদুর সাজ;
নাচিত শেখরে শত বধূমান কোকিলের সুরে সুর,
সোনার সাহারে শুনাইত গান ঘুমঘুমী চৌটি পুরে।

এমনি ভাবিয়া কতদিন তারে দেখেছি কত না রূপ,
নিয়ে গেছি তারে কত নব দেশে উড়ায়ে মনের ধূপ।
আমি ভাবিতেছি, সোনার বধূ! তব মুখপানে চেয়ে,
তুমি কি আজিও সেদিনের সেই ফুলবনের মেয়ে?
আজি মনে পড়ে সেই কবে তুমি হারায়ে নায়ের পথ,
এই বালুচরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরাইতেছিলে পথ।
সেই নব আঁখি মুছিয়া দিলাম,—অনন্ত কৃতজ্ঞতা,
মোর পানে চেয়ে আঁখি নোয়াইলে, মুখে ফুটিল না কথা।
তার পর সেই কত ছল করি কত তারে দেখা হল,
সেই সব কথা স্মরিয়া এখন আঁখি করে ছল ছল।
কোনদিন আমি লুকাইয়া থাকি গহন কদম্বের তলে,
তোমার বাঁশীটি হাতেতে লইয়া অমনি নিজ মনে।

সাঁঝের সহিত জল নিয়ে যেতে শুনি পরিচিত সুর,
কাঁখের কলসী ভারি হয়ে যেতো, সখিরা বলিত,—দূর,
পোড়ারমুখির সবখানে দেরি,—থাক এ পথের মাঝে।
তারা চলে যেতো, তব বাঁকা মুখ আরো বাঁকা হত লাজে
পিছন হইতে সহসা চাহিয়া বাঁধিতাম চোখ দুটি,
তিলেও আমারে হাত করে ইহা বলিতে না মুখ ফুটি।
তারপর সেই দুজনে বসিয়া এখনি নদীর বাঁকে,
সোনার স্বপন কুড়ায়ে কুড়ায়ে গাঁথিতাম মোরা হার।

আমি বলিতাম, এই বালুচরে বাঁধিব একটি ঘর,
কলার পাতা দোলাইবে ছায়া তাহার আবাস, পর।
উঠানে তাহার রেখে দেব আমি বাঁশের আড়ালখানি,
তুমি তারি তলে চাকাই দিবের হাঁসা লাগাইও আনি।
অঞ্জলা ভরিয়া ফেলিবে খুঁজিয়ে চাকাই দিবের মতো,
মোরা তারি পরে পড়িব মোদের গোপন প্রেমের কথা।
তুমি বলিতেছ, নবান্ন দিনে ঝাঁটি ঝাঁটি ধান দিয়ে,
অতিথি সাধুর কুঝাম আমার পেঁয়া পথ দিব দিয়ে
হলুদ-কুলায় প্রদীপ সাজায়ে বধূবরের সাথে,
তোমারে বরণ করিয়া লইব আমি আপনার হাতে
এমনি করিয়া দিনের আমরা কথার মালিকা গাঁথি,
সাজায়ে সাজায়ে রেখেছি তাহারে বিগত দিনের সাথী।
তারা চলে গেছে, মোদের হাতের কলস-ফুল ঝরে,
হিসেব করিতে ভুলে গেছে তারা কতবার গেল ঝরে।
কখনো তোমারে ডাকিয়া বলেছি—কলাকে আসিও সই,
সন্ধ্যা আমার কাটিবে না কভু একেলা তোমারে বই।

তুমি আস নাই, শুধু দিয়েছে চলিয়া পশ্চিমে বেলা,
আমি রাগ করে কিছুই তোমারে ছুঁড়িয়া ফেলেছি ঢেলা,
সোনার কলস আছিল তাহার সে যদি ভুবিতে চায়,
পিছে চেয়ে দেখি মৃদু মৃদু হেসে তুমি এলে বাঁকা পায়।
তাড়াতাড়ি তুমি যেতে চাহিয়াছ, কাশের পাতার সনে,
তোমার শাড়ীর আঁচল বাঁধিয়া হাসিয়াছি মনে মনে।
ফুল-কুসুম কত দিয়া যে কেমন কেটেছে ভোর,
সেই সব কথা এখন সজনী, মনে হয় বার বার।
কতদিন আমি তোমারে বলেছি, সোনালো সোনার সই,
তুমি যদি হও সন্ধ্যার তারা, আমি যদি চাঁদ হই
প্রতিদিন মোরা এমনি আকাশে এ-উহার পানে চেয়ে,
স্বপনের দেশে ঘুমায়ে পড়িব বাঁশরীতে গান গেয়ে।

আজিকে সজনী, ফুরাল মোদের এ বালুচরের খেলা,
আমাদের ঘাটে ভিড়িয়াছে আসি পরদেশী হতে ভেলা;
আমি চলে যাব এক দেশে সখি, তুমি যাবে আর দেশে,
সেথায় মোদের এই বালুচর সাথে নাহি যাবে ভেসে।
মোরা যে স্বপন গড়েছিনু তারে সেকথা হইল বাসি,
যা হবার তাই হইল, এখন কি হইবে মিছে কাঁদি।
তুমি চলে যাবে, আমিও যাইব, এস তবে শেষবার,
এই বালুচরে লিখে রেখে যাই যত কথা আছে যার।
আমিও তোমারে ভুলিব সজনী। তুমি ভুলে যাবে মোরে,
বালুর আখরে বাঁধিলে কি-হবে? থাকে না জনম ভোরে।
তোমারে আমারে ভুলায়ে সজনী অনন্ত সুরতারা,
অনন্ত শীত, অনন্ত আলো হইবে আত্মহারা।

মহাকাল তার চক্রের ঘায়ে ছিঁড়িবে স্মৃতির ফুল,
দিবস-রজনী দুটি ভাই-বোন মালায় গাঁথিবে ভুল।
তুমি ভুলে যাবে, আমিও ভুলিব, অনন্ত কতক্ষণ
সহসা আসিয়া জুড়িয়া বসিবে মোদের হৃদয়-কোণ।
অনাগত ব্যথা অনাগত সুখ পাতিয়া কুহকজাল,
ঢাকিয়া ফেলিবে মনের গহিনে আজিকার এই কাল।
সেই দূর দেশে হয়ত কখনো অজানা সুরের মত,
মাঝে মাঝে এসে উঁকি মেরে যাবে এ কালের দিন যত।
এই নদীতটে দাঁড়ায়ে কখনো হেরিব সুদূর পারে,
ঝিল-বালু-লেখা জল-ঢেউ সনে দুলিয়ে রূপালী হারে।
সেথা হতে কভু দূরাগত কোনো মেঠো রাখালের বাঁশী,
আধ বোঝা যায়—আর না বোঝায় শ্রবণে পশিবে আসি।

সন্ধ্যা

আরো অল্পকাল দাঁড়াও সন্ধ্যা
মৃদু মন্থর পায়ে,
তোমার মাণিক আলোক তোমার
আঁধারে আঁচল ছায়ে।

কপালে চাঁদের পরাইব টীপ,
চরণে পরাব রাতের প্রদীপ,
ঝিঁঝির নূপুর শুনিতে শুনিতে
ঘুম যেও বন-ছায়ে।

আকাশ ভরেছি সিঁদুর রাগে
মেঘে মেঘে রঙ মেখে,
অলস আলোকে বিছায়েছি পথে
কোথা যাবে সব রেখে।

এমন মৌন গোধূলি লগনে,
হৃদয়ে হৃদয়ে কম্পন গোপনে
কিছুবা বলিব কিছু না বলিব
রাতের তিমির ছায়ে;

আরো অল্পকাল দাঁড়াও সন্ধ্যা
মৃদু মন্থর পায়ে।

মুসাফির

চল মুসাফির গাহি,
এ জীবনে ভাই ব্যথা আছে শুধু, ব্যথার দোসর নাহি।
নয়ন ভরিয়া আছে আঁখিজল, কেহ নাহি মোছাবার,
হৃদয় ভরিয়া কথার কাকলি, কেহ নাই শুনিবার,
চলে মুসাফির নির্জন পথে, দুপুরের উঁচু বেলা,
মাথার উপরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া করিছে আগুন-খেলা।
দুধারে উদাও বৈশাখ-মাঠ রৌদ্দরে বুকে চাপি,
ফাটিলে ফাটিলে চৌচির হয়ে করিতেছে দাপাদাপি।
নাচে উলঙ্গ দমকা বাতাস ধুলায় বসন ছিঁড়ে,
ছুঁড়িয়ে ছুঁড়িয়ে আগুন ঝলায় মাঠের চৌধারে ফিরে।
দূর পানে চাহি হাঁকে মুসাফির, আয়, আয়, আয়, আয়,
কম্পন জাগে ঘর দুপুরের আগুনের হল্কায়।
তারি তালে তালে দুলে দুলে উঠে দুধারের স্তব্ধতা,
হেলে নীলাকাশ দিগন্তে বেড়ি বাঁকা বনরেখা-লতা।
চলে মুসাফির দূর দুরাশার অন্তহীন পথ পাড়ি,
বুকে করাঘাত হানিয়া সে যেন কি ব্যথা দেখাবে ফাড়ি।
নামে নিদাঘের দুপুরের বেলা, আসে এলোকেশী রাতি,
গলায় তাহার শত তারকার মুণ্ডমালার বাতি।
মেঘের খড়্গে রবিরে বধিয়া নাচে সে ভয়ঙ্করি,
দূর পশ্চিমে নিহত দিনের ছিন্নমুণ্ড ধরি।
রুধির লেখায় দিগন্ত ছেয়ে গেল সে রসনা মেলি,
হাসে দিগন্ত ঘন ডাকিনী করিয়া রক্ত-কেলি।

চলেছে পথিক—চলেছে সে তার ভয়ঙ্করের পথে
বেদনা তাহার সাথে সাথে চলে সুরের ইন্দ্ররথে।
ঘরে ঘরে জ্বলে সন্ধ্যার দীপ, মন্দিরে বাজে শাঁখ,
গাঁয়ের ভগ্ন মসজিদে বসি ডাকে দুটো দাঁড়কাক।
কবরে বসিয়া মাথা কুটে কাঁদে কার বিরহিনী মাতা,
চলেছে পথিক আপনার মনে বকিয়া বকিয়া যা-তা।

চলেছে পথিক—চলেছে পথিক—কতদূর—কতদূর,
আর কতদূর গেলে পরে সে যে পাবে দেখা বন্ধুর।
কেউ কি তাহার আপনার চাহি পথেরে বরে যায়?
দুয়ার ধুলায় কাঁদিয়া কি কেউ ভিজায়েছে বেশবাস?
কেউ কি তাহারে দেখায়েছে দীপ কোনো গেঁয়ো ঘর হতে,
মাথার কেশেতে পাঠায়েছে দেখ পঙ্কিনী নদীস্রোতে?

চলেছে পথিক, চলেছে সে তার ললাটের লেখা পড়ি,
সীমারেখাহীন পথ-মায়াবির অঙ্কশায়ী ছবি।
ঘরে ঘরে ওঠে মৃদু কোলাহল, বধূরা বঁধুর গলে,
বাহুর লতায় বন্ধুরে বাঁধিয়া প্রণয়-দোলায় দোলে।
বাঁশী বাজে দূরে সুখ-রজনীর মদিরা সুবাস ঢালি,
দীঘির মুকুরে হেরে মুখ রাত চাঁদের প্রদীপ জ্বালি।
নতুন বধূর বক্ষ জড়ায়ে কচি শিশু হাত তুলি,
হাসিয়া হাসিয়া ছড়াইছে যেন মণি-মাণিক্যের ধূলি।
চলেছে পথিক—রহিয়া রহিয়া করিছে আর্তনাদ,
ও যেন কাহার সকল সুখের জীবন্ত প্রতিবাদ।

রে পথিক! বল্, কারে তুই চাস, যে তোরে এমন করে,
কাঁদাইল হায়, কেমন করিয়া রহিল সে আজ ঘরে?
কোন ছায়া-পথ নীহারিকা পারে, দেখিয়াছিলি তুই কারে,
কোন সে কথার মানিক পাইয়া বিকাইলি আপনারে।
কার সেহ ছায়ে শুনেছিলি তুই চুড়ির ঝিনিকি-ঝিনি,
কে তোর ঘাটেতে এসেছিল ঘট বুড়াইতে একাকিনী।

চলে মুসাফির আপনার মনে, কোন দিকে নাহি চায়,
দূর বনপথে থাকিয়া থাকিয়া বউ-কথা পাখি গায়।
গগনের পথে চাঁদেরে বেড়িয়া ডাকে পিউ, পিউ, কঁহা,
সে মৌন চাঁদ আজো হাসিতেছে, বলিল না, উহু আহা।
বউ কথা কও—বউ কথা কও—কতকাল—কতকাল,
রে উদাস, বল, আর কতকাল গাহিবি সুরের জাল।
সে নিঠুর আজো পরাল না কথা, রহস্য-যবনিকা
খুলিয়া আজিও পরাল না কারো ললাটে প্রণয়-টীকা।
চলেছে পথিক চলেছে সে ওরে দূর দূরাশার পারে,
কোন-পথবধূকে পিছু ডাকে আজ ফিরাল না কেউ তারে।
চলেছে পথিক চলেছে সে যেন মৃত্যুর মত ধীরে,
যেন জীবনের হাহাকার আজি কাঁদিছে অন্তরে ঘিরে।
চারিদিক হতে গ্রাসিয়াছে তারে নিদারুণ আঁধার,
নীরবতা যেন জমাট বেঁধেছে ক্রন্দন শুনি তার।

আর একদিন আসিও বন্ধু

আর একদিন আসিও বন্ধু—আসিও এ বালুচরে,
বাহুতে বাঁধিয়া বিজলীর লতা রাঙা মুখে চাঁদ ভরে।
তটিনী বাজাবে পদ-কিঙ্কিণী পাখীরা মেলাবে ছায়া,
সাদা মেঘ তব সোনার অঙ্গে মাখাবে মেঘের মায়া।
আসিও সজনী, এই বালুচরে, আঁকা বাঁকা পথখানি,
এধারে ওপারে ধান-ক্ষেত তারে লয়ে করে টানাটানি।
কখনো সে গেছে ওধারে বাঁকিয়া কখনো এধারে আসি,
এরে ওরে লয়ে জড়াজড়ি করে ছড়ায় ধূলার হাসি।
এই পথ দিয়ে আসিও সজনী, প্রভাতে ও সন্ধ্যায়,
শিষ-জোড়া ধানের ক্ষেতের গন্ধ মাখিয়া গায়।
—চরের বাতাস বাতাস করিয়া শীতল করিছে যারে,
সেই পথে তুমি চরণ ফেলিয়া আসিও এ নদী পারে।

আর একদিন আসিও সজনী! এ মোর কামনাখানি,
বুক বালুচরে আখরে এঁকেছি নখরে নখরে হানি।
লিখিয়াছি তাহা পাখির পাখায় মোর নিঃশ্বাস ঝড়ে,
আর লিখিয়াছি দূর গগনের কনক মেঘের ছুড়ে।
সেই সব তুমি পড়িয়া অলস অবশ কায়,
এই খানে এসে আসিও বন্ধু, মোর বেনুবন ছায়।
এই বেনুবনে মোর সনে সাথে কাঁদিয়াছে বহু রাতি,
পাতায় পাতায় জড়াজড়ি করি উতল পবনে মাতি।

এই খানে সখি! সাক্ষ্য হইয়া রাতের প্রহরগুলি,
কত যে গভীর বেদনা আমার বলিবে খুলি।
রাত-জাগা পাখি কহিবে তোমারে, আমার যে-ঘুম রাতি,
কাটিতে কাটিতে কি করে নিবেছে একে একে সব বাতি।
সেইখানে তুমি বসিও সজনী! মনে না রাখো ভয়,
সেদিন কাহারো কোন অভিযোগ হানিবে না কারো পর।
সেদিন আমারে যত কথা সখি! এই মূক মাটি তলে,
মোর সাথে সাথে ঘুমায়ে রহিবে মহা-মৃত্যুর কোলে।
এই নদীতটে বরষ বরষ ফুলের মহোৎসবে,
আসিবে যাহারা তাহাদের মাঝে মোর নাম নাহি রবে।

সেদিন কাহারো পড়িবে না মনে, অভাগা গাঁয়ের কবি,
জীবনের কোন্ কনক বেলায় দেখেছিল কার ছবি।
ফুলের মালায় যে লিখিল তারে মোহের নিমন্ত্রণ,
কে দিল তাহারে বুকের ভেতর নিদারুণ হুতাশন।
সেদিন কাহারো পড়িবে না মনে কথা এই অভাগার,
জানিবে না কেউ কত বড় আশা জীবনে আছিল তার।
ধরণীর বুকে প্রদীপ রাখি সে, আকাশের ডাক দিত,
মাটির কলসে জল ভরে সে যে তটিনীরে বুকে নিত।
এত বড় আশা কি করে ভাঙিল, কি করে জীবন ভোর,
মরু-কুহেলির সোনার স্বপন ভাঙিল নিঠুর চোরে।
এসব সেদিন স্মরিবে না কেহ, দুখ নাহিক তায়,
যে গেল তাহারে ফিরায়ে আনিতে পিছু-ডাক নাহি যায়।
যে দুখে আমার জীবন বহিল সে দুখের স্মৃতি বহি,
সবার মাঝারে রহিব যে বেঁচে, এর চেয়ে নাহি ক্ষতি।

তুমিও আমারে ভেবোনা সেদিন, আমার দুখ তায়;
এতটুকু ব্যথা নাহি আনে যেন কোনদিন মনে করে।
এ মোর জীবনে তোমার হাতের পেয়েছিনু অবহেলা,
এই গৌরব রহিল আমার ভরিতে জীবন বেলা।
তুমি দিয়াছিলে আমারে আঘাত, তারি ব্যথা মহীমায়
সবার আঘাত দলিয়া এসেছি এ মোর চরণ ঘায়।
তোমারে আমার লেগেছিল ভাল, আর সব ভাল তাই
আমার জীবনে এতটুকু দাম কেহ কভু আঁকে নাই।
তোমারে নিকটে পেয়েছিনু ব্যথা তারি গৌরব ভরে,
আর সব ব্যথা খড়কুটা সম ছিঁড়িয়াছি নখে ধরে।

তুমি দিয়েছিলে ক্ষুধা,
অবহেলে তাই ছাড়িয়া এসেছি জগতের যত সুধা।
এ জীবনে মোর এই গৌরব তোমারে যে পাই নাই,
আর কারো কাছে না-পাওয়ার ব্যথা সহিতে হয়নি তাই।
তোমার নিকট কণিকা না পেয়ে আমি হয়েছিনু ধনি—
আমার লুটিবে ছড়াছড়ি যেত রতন মানিক মনি।

তাই সেই শুভক্ষণে—
মোর পরে তব যত অন্যায় আনিও না কভু মনে।
আমারে যে ব্যথা দিয়েছিলে তুমি, তাতে নাহি মোর দুখ,
তুমি সুখে ছিলে, মোর সাথে রবে এই স্মরণের সুখ।

আর একদিন আসিও সজনী! মোর কণ্ঠের ডাক
যতদিন তুমি না আসিবে যেন নাহি হয় নির্বাক।
এ মোর কাদনা পাখি হয়ে যেন এই বালুচরে ফেরে,
যেন বাজ হয়ে গগনে গগনে মেঘের বসন ছেঁড়ে।

আর একদিন আসিও বন্ধু

এই কথা আমি ভরে রেখে যাই খর-তটিনীর জলে,
যেন দুই কূল ভাঙিয়া সে চলে আপনার কল্লোলে।
আর একদিন আসিও সজনী। এ আমার অভিশাপ
যত দিন যাবে পলে পলে এর বাড়িবে ভীষণ তাপ।
এই বাসনার ইন্ধন জ্বালি সাজালেম যেই হোম
কাল-নটেশের চরণের তালে জ্বলে যেন নির্মম।
যেন তারি দাহ সপ্ত আকাশ ভেদিয়া উপরে ধায়,
চন্দ্র-সূর্য পুড়িছে। পড়ে তারি নিশ্বাস ঘায়
যেন সে বহ্নি শত ফনা মেলি করে বিষ উদ্গার,
তারি দাহ হতে তুমি যেন কভু নাহি পাও উদ্ধার।
যতদিন তুমি এই বালুচরে নাহি আস পুন ফিরে,
আমি এই কথা লিখে রেখে যাই বালুকার বুক চিরে।

বিজলীতে আমরা জসীমের "নক্সী-কাঁথা মাঠে"র অন্তরের সৌন্দর্য— তার আঁকা পল্লীপ্রাণের হৃদয়ের সুমধুর ছবি খুলে দেখিয়েছিলাম। বালুচরের কবি সেই সুরে, সেই ছবি, সেই রূপরেখা আবার জাগিয়েছেন।

বাঁশরি আমার হারায়ে গিয়াছে বালুর চরে,
কেমনে ফিরিব গোধন লইয়া গাঁয়ের ঘরে?

০ ০ ০

কোথায় খেলার সাথীরা আমার কোথায় ধেনু,
সাঁঝের হিয়ায় বাজিয়া উঠিছে গোক্ষুর রেণু।

০ ০ ০

তোমায় অভিশাপ দেব এই হারানো বাঁশী ইহ-জন্মে আর যেন তুমি খুঁজে না পাও, তবেই না পল্লী-লক্ষ্মীর ছবিখানি আমাদের চোখ ভরে মর্ম জুড়ে তোমার সুরে দুলে উঠবে।

জিতা রহো ভাই, বাঙলার কবি। কে বলে তুমি মুসলমান, কে বলে তুমি হিন্দু, তুমি ত অত ছোট নও যে ধর্মের ময়ূরপঙ্খী দাঁড়কাক সাজবে। বাঁশী তোমার চিরদিনই হারিয়ে থাক ঐ পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের বালুর চরে, বালুর চরে জুড়ে উঠুক তোমার রূপের রেখা, ধানের গীতি, প্রাণের দরদ, আম বনের মায়া, ঢাকাই শিমের আঁচল চিরদিনই সেই হারানো বাঁশির সুরে।

উড়ানীর চর ধূলায় ধূসর যোজন জুড়ি,
জলের উপর ভাসুক ধবল বালুর পুরি।

০ ০ ০

আজলা ভরিয়া লাউ এর লতায়,
লক্ষ্মী সে যেন দুলিছে দোলায়,
ফাগুনের হাওয়া কলার পাতায় নাচিছে ঘুরি
উড়ানী চরের বুকের আঁচল কৃষাণ পুরি।

কবির দরদিয়া ওপারে: "কাল সে আসিবে," তার আশা, আনন্দ, ভয় ব্যাকুলতা ও আত্মদানের যে চিত্র কবি এঁকেছেন তা অনবদ্য।

কাল সে আসিবে মুকখানি তার নতুন চরের মত,
চখা আর চখী নরম ডানায় মুছায়ে দিয়েছে কত।

০ ০ ০

কবির এ চিন্তামনির নাচ-দুয়ার থেকে কত রত্ন আর কুড়িয়ে দেখাব। সারা বালুচরখানি তার দেশ লক্ষ্মীর রাঙা পা দুখানির স্পর্শে মনিময় হয়ে গিয়েছে।

০ ০ ০

আজও বসে আছি এই বালুচরে, দু'হাত বাড়ায়ে ডাকি—
কাল যে আসিবে এই বালুচরে, আর সে আসিবে নাকি?

হায়রে রূপের অতৃপ্ত তৃষ্ণা, প্রেমের অক্ষয় সাধ, ছন্দের আজন্ম আকূতি! ওই পিপাসা মিটলে কবি যে ফুরিয়ে যায়। কবির "প্রতিদিন" তাই কত না অপূর্ব অনবদ্য অনুপম; এ প্রতিদানেরও তুলনা কেবল বুঝি বাঙলার স্নিগ্ধ দুধালীলতার রূপেই মেলে।

—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

for more bangle golden literature……. Just banglainternet.com